

বর্ষাকাল
অথবা, বাংলার বর্ষা / বর্ষায় বাংলা
অথবা, বর্ষা ও বন্যা / বর্ষার বাংলাদেশ

ভূমিকা :

কুলাই কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকৃতিবষ্কের ঋতুরঙ্গ – নাট্যশালার দ্বিতীয় অঙ্কে রাজার মতো আবির্ভাব ঘটে বছরের দ্বিতীয় ঋতু বর্ষার। গ্রীষ্মের অপূর্ব অগ্নিবাণে বাংলার এ অঞ্চল যখন শুষ্ক হয়ে ওঠে, ঠিক তখন নিদাঘ তপ্ত আকাশের এক স্থান থেকে অপর স্থান পর্যন্ত ঢেকে যায় গাঢ় কালো মেঘে। মহাশূন্যের কোনো এক গুহা থেকে বাধন ছেঁড়া বায়ু তীব্র গতিতে ছুটে আসে। শুরু হয় বর্ষাকাল। প্রবল ধারায় চলতে থাকে বর্ষণ। মাটির তলদেশ থেকে ভূগাঙ্কুর মাথা তুলে উঁকি মারে। রুক্ষ, শুষ্ক, শীর্ণ তরুলতা অঙ্গে জাগ্রত হয় তারুণ্যের সবুজ শিহরণ। বর্ষায় বিচিত্র ফুলের আগমন কদম, কেয়া, কামিনী, জুঁইয়ের আত্মপ্রকাশে চারিদিক আমোদিত হয়। নয়নরঞ্জন নবিনা বর্ষার এ হচ্ছে আসল রূপ, অনুপম সৌন্দর্যশ্রী।

বর্ষার পল্লী : বর্ষা ঋতুতে পল্লীবাংলা ধারণ করে অসাধারণ মূর্তি। দিগন্তহারা জল ছলছল মাঠে কচি ধানের চারা গুলো হাওয়ায় দোলে। পাটের চারাগুলো পানির উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। খাল-বিল নদী-নালায় কলকল শব্দে স্রোত বয়ে যায়। নদীতে পালতোলা নৌকা দ্রুতগতিতে ছুটে চলে। মেঘমেদুর আকাশে স্নিগ্ধ কান্তি, পুকুরপাড়ে কদম–কেয়া ফুলের চিওহারা সুরভীর অজস্রতা। সবকিছু মিলে এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়, যাতে মানুষের অন্তর সাড়া না দিয়ে পারে না। বাঙালিচিত্তে এরূপ বর্ষার প্রভাব অসামান্য। তার

স্বাক্ষরও পাওয়া যায় বাংলা কাব্যজগতে।

“নীল নবঘণে আশার গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনায়েছে দেখ চাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।”
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শহরে বর্ষা : পল্লীর মতো শহরে বর্ষা বিচিত্র রূপ নিয়ে আসে না। শহরে বর্ষা তৈরি করে নানা সমস্যা। বিশেষ করে বাংলাদেশের শহরাঞ্চল অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার ফলে নিম্নাঞ্চল ডুবে আসে। উন্নত পয়োনিষ্কাশনের অভাবে ড্রেন পানিতে তলিয়ে শহরের রাস্তায় উঠে যায়। যার ফলে বিঘ্নিত হয় জনজীবন। এই সুযোগে রিক্সা ও স্কুটার চালকরা অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করে। এমনকি বেড়ে যায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। সবকিছু মিলিয়ে শহরে বর্ষা আসে অভিশাপ হয়ে।

বর্ষার প্রকৃতি : বর্ষায় বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীতে প্রকৃতি এক অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করে। প্রকৃতির এই রূপ বৈচিত্রের সঙ্গে পল্লীর মানুষের প্রত্যাহিত জীবনেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। বর্ষা ও বৃষ্টির অবিরল জলধারা বনপথে অপরূপ ছন্দ ও সুর তোলে। কদমফুল ফুটে শুরু করে। হিজলের বনে ফুলের মেলা বসে। সেই আনন্দে তাল নারিকেলের কুঞ্জ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোলে, কখনো বা জড়িয়ে যায়, পরস্পর কোলাকুলি করে। কখনো বা বাতাসের স্পর্শে বেকেচুরে এমন আকার ধারণ করে যে, দেখলে মনে হয় গাছপালা সব পত্রপুটে ফটিক জল পান করছে। বর্ষাপ্রকৃতির এই রূপ সত্যিই অপূর্ব।

বন্যারূপে বর্ষা : বর্ষার রূপ শুধু কোমল-মধুর নয়, তার মধ্যে কঠোরতাও আছে, আছে রুদ্রমূর্তি। যাকে বলা হয় বন্যা। বিফুর্ন বর্ষা অর্থাৎ বন্যার ভয়াল

রূপ দেখতেও এদেশের প্রকৃতিপ্রেমিক কবিদের কতনা আনন্দ। কোমলতায়–কঠোরতায় মিশ্রিত বর্ষার যে রূপ, তার সঙ্গে অন্য ঋতুর তুলনাই হয় না। বর্ষার তুলনা শুধু বর্ষাই। বন্যা রূপে বর্ষার নির্মমতা সত্যি অবিশ্বাস্য। বন্যা তার সাম্যবাদী শক্তি দিয়ে সমগ্রকিছু একাকার করে দিয়ে যায়। এখানেই বর্ষার কঠোর রূপের প্রকৃতির সার্থকতা।

বর্ষার প্রভাব : মানব মনে বর্ষার প্রভাব ব্যাপকতার মাত্রা অতিক্রম করে। বৃষ্টি মুখর দিনে মানুষ ত্যাগ করে তার কৃত্রিমতা। সচেতন মনের অগোচরে বেজে ওঠে প্রিয় গান বা কবিতা। তার মনের গভীরে ভেসে ওঠে প্রিয় কোন স্মৃতি অথবা ফেলে আসা কোন প্রিয় মুহূর্তের কথা। এমন সময় নজরুলগীতি কিংবা রবীন্দ্রসংগীত মন কেড়ে নেয়। মনের অজান্তেই হয়তো গেয়ে ওঠে কোন পথহারা প্রেমিক –

“শাওনও রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে।”

উপসংহার : এত কিছুর পরেও এ কথা সত্য যে, বর্ষা জীবনে আনে বৈচিত্র। তাই তো বর্ষা কবির ঋতু, সংগীতের ঋতু, চাষির ঋতু, ছুটির ঋতু, অবকাশের ঋতু। গ্রীষ্মের তপস্যার অবসান ঘটে বর্ষার আগমনে। তাইতো বর্ষাকে এত ভালো লাগে। সুতরাং নির্দিধায় বলা যায়–বর্ষা সবারই প্রিয় ঋতু।